মাদকের বিরুদ্ধে চাই "শূন্য সহিষ্ণুতা"

ইমদাদ ইসলাম

যুব সমাজ আগামী দিনের ভবিষ্যৎ। তাদের হাতেই রচিত হবে আমাদের স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য মাদক আমাদের যুব সমাজের একটি অংশকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। এতে আমাদের সামাজিক স্থিতিশীলতা, নৈতিকতা এবং সামগ্রিক উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করছে। বাংলাদেশ মাদক উৎপাদনকারী দেশ না হলেও বর্তমানে এদেশের যুব সমাজের মধ্যে মাদকাসক্তি এবং এর ক্ষতিকর প্রতিক্রিয়া প্রকট হয়ে উঠছে। চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, চাঁদাবাজিসহ বিভিন্ন সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের সাথে অবৈধ মাদক ব্যবসা ও মাদকাসক্তির গভীর যোগসূত্র রয়েছে। মাদকদ্রব্য আমাদের জনস্বাস্থ্য, আইন -শৃঙ্খলা, আর্থসামাজিক স্থিতিশীলতা ও নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরুপ।

আমাদের সংবিধানের ১৮(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বর্তমান সরকার মাদকাসক্তিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে দৃঢ় অঙ্গীকারাবদ্ধ। জাতীয় শিক্ষানীতি-২০১০(অধ্যায় ১৭,১৮),৭ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা (অধ্যায় ১.৫),রূপকল্প -২০৪১, এসডিজি ও সরকারের নির্বাচনি ইশতেহারেও (৩.১১ অনুচ্ছেদ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণের বিষয়টিতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। নির্বাচনি ইশতেহারে উল্লেখ করা হয়েছে ' মাদকের বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্স ও চলমান অভিযান অব্যাহত থাকবে। মাদকাসক্তদের পুনর্বাসনের জন্য সরকারি অর্থায়নে সংশোধনাগারের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হবে।"

মনুষ্য সমাজে মাদকের আদি ব্যবহার শুরু হয়েছিল মনুষ্য জীবন প্রবাহের শুরু থেকেই জীবনের প্রয়োজনে শতশত বছরের পরীক্ষা নিরীক্ষা, trial error এবং অনুশীলনের মাধ্যমে। আদিম মানুষেরা বন্য প্রাণী শিকার করতে গিয়ে, কিংবা গোত্রে গোত্রে সংঘাত থেকে আঘাত এবং জখম - উদ্ভূত কষ্ট ও যন্ত্রণা লাঘবের জন্য, কিংবা বিভিন্ন শারীরিক পীড়া ও বিকার নিরাময়ের জন্য হাতের কাছে যা কিছু পেয়েছে তা-ই ব্যবহার করেছে। এভাবে বিভিন্ন প্রয়োজনে বারবার বিভিন্ন জিনিস ব্যবহার করতে করতে এক সময় বিশেষ কাজে বিশেষ জিনিসের কার্যকরিতা লক্ষ্য করে মানুষ পরবর্তীতে অনুরূপ কাজে এর ব্যবহার শিখেছে, যাকে আমরা এখন ওষুধ হিসেবে অভিহিত করি। কালক্রমে ওষুধরূপী এসব মাদকের আনন্দদায়ক, বেদনানাশক, প্রশান্তিদায়ক,ঘুমদায়ক, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিদায়ক, ইন্দ্রজাল সৃষ্টিকারক গুণাবলির জন্য এগুলো বিনোদন, যাদু- টোনা, ধর্ম সাধনা, অতীন্দ্রিয় অনুভূতিলাভ, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহার হওয়া শুরু হয়েছিল।

অতি প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্নভাবে গাঁজা গাছ জন্মাতে দেখা গেলে ও এর ব্যাপক এবং বাণিজ্যিক আবাদ প্রথম কবে কোথায় শুরু হয়েছিল এ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো তথ্য পাওয়া যায় না। তবে জনশ্রুতি আছে ১৭২২ সাল নাগাদ উত্তরবঙ্গের বর্তমানে নওগাঁ জেলায় গাঁজার আবাদ শুরু হয়েছিলো। বৃটিশ সরকার ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেওয়ার পর ১৮৭৬ সালে নওগাঁয় গাঁজার আবাদ, উৎপাদন ও বিক্রয়ের জন্য লাইসেন্স প্রথা চালু করলেও চাষিদের উৎপাদিত গাঁজার বিপণনের জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা ছিলনা। সে সময় নওগাঁর গাঁজা সারাভারত বর্ষে এমনকি বিদেশেও যেতো। গাঁজা থেকে বৃটিশ সরকার রাজস্ব এবং মধ্যস্বত্বভোগী ফড়িয়ারা বিপুল মুনাফা অর্জন করলেও চাষিরা বরাবর বঞ্চনার শিকার হতো। এ বঞ্চনা থেকে মুক্তির জন্য নওগাঁর গাঁজা চাষীরা সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে ১৯১৭ সালে ' নওগাঁ গাঁজা কাল্টিভেটর্স কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিঃ' নামে একটি সমবায় সমিতির গঠন করে। জন্মলগ্নে এ সমিতির সদস্য সংখ্যা মাত্র ১৮ থাকলেও ক্রমান্বয়ে তা বেড়ে ৭ হাজারে দাঁড়ায় এবং এ সমিতি এক সময় এশিয়ার বৃহত্তম সমবায় সমিতিতে পরিণত হয়। এ সমিতির মাধ্যমে ১৯১৮ থেকে ১৯৪৭ সালে ভারত ভাগের পূর্ব পর্যন্ত বছরে গড়ে ৫৫ হাজার মন গাঁজা উৎপাদন হতো। এই বিপুল পরিমাণ গাঁজার সমুদয় অংশই সমিতিতে জমা হতো এবং সমিতির সদস্য চাষিরা সরকার নির্ধারিত হারে যার যার জমাকৃত গাঁজার পরিমাণ অনুপাতে গাঁজার মূল বুঝে পেতো। এ গাঁজা অবিভক্ত বাংলায় বিক্রয় ছাড়াও আসাম,উড়িষ্যা, উত্তর প্রদেশ,চেন্নাই, মায়ানমার, নেপাল এবং সুদূর বৃটেনসহ ইউরোপের অনেক দেশে রপ্তানি হতো।

বাংলাদেশে ঠিক কত মানুষ মাদকাসক্ত তার সঠিক কোনো হিসেব পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন তথ্য উপাত্ত থেকে ধারণা করা হয় এ সংখ্যা কম বেশি ৯০ লাখ। তবে এটা ঠিক মাদকসেবীদের অধিকাংশই বয়সে তরুণ। মাদকাসক্তদের মধ্যে শতকরা পাঁচ জন নারী। নারী আসক্তদের ৯০ ভাগের বয়স ১৫-৩৫ বছরের মধ্যে। বাকিদের বয়স ৩৫-৪৫ বছরের মধ্যে। তবে উদ্বেগের কারণ হলো আমাদের দেশে মহিলাদের মধ্যে ও মাদক সেবনের প্রবণতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। মহিলা মাদকাসক্তদের মধ্যে ছাত্রী,গৃহিণী, ব্যবসায়ী ও চাকরিজীবী রয়েছে। বাংলাদেশে সাধারণত যে সকল মাদক ব্যবহার করা হয় সেগুলো হলো সিগার, সিগারেট, বিড়ি, পাইপের মাধ্যমে ধূমপান, হুক্কা, শিশা, তামাক, সাদা পাতা, গুল, হিরোইন, ফেনসিডিল, আইস, ইয়াবা, এলএসডি, দেশি-বিদেশি মদ, কোকেন, ইনজেকটিং ড্রাগ এ্যাম্পুল ইত্যাদি। তবে সবচেয়ে বেশি ইয়াবা, হেরোইন , গাঁজা ও ফেনসিডিলের অপব্যবহার বাংলাদেশে পরিলক্ষিত হচ্ছে। ক্রমাগত মাদক গ্রহণে মানুষের শরীরের ওজন কমতে থাকে, অনিদ্রা, অনাহার, অনিয়ম, অযত্ন ইত্যাদির মধ্য দিয়ে শরীর শুকিয়ে যায়। সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি ভয়ংকর হিসেবে বিবেচনা করা হয় ইয়াবাকে। ইয়াবা গ্রহণের ফলে মাদকাসক্তের কিডনি, লিভার ও ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

মাদকাসক্তির পেছনে বিজ্ঞানী এবং গবেষকরা বিভিন্ন কারণ চিহ্নিত করেছেন, সেগুলো হলো সমবয়সিদের চাপ, মাদকদ্রব্যের সহজলভ্যতা, বেকারত্ব, আর্থসামাজিক অস্থিরতা, মাদকের কুফল সম্পর্কে অজ্ঞাতা, সমাজে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, পারিবারিক কলহ, চিকিৎসাসৃষ্ট মাদকাসক্তি, কৌতুহল ইত্যাদি। মাদকদ্রব্যের চাহিদা ও সরবরাহের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। চাহিদা হ্রাস করতে পারলে মাদকের সরবরাহও কমে যাবে। মাদকের বিরুদ্ধে জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ

তথ্য অধিদফতর, গণযোগাযোগ অধিদপ্তর,চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর,বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন নিয়মিত প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে।

মাদকাসক্তদের সুস্থ জীবনে ফিরিয়ে আনতে সরকারি ও বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সরকারি চিকিৎসা কেন্দ্রে বিনামূল্যে রোগীদের থাকা, খাওয়া, ওষুধপত্র ও চিকিৎসা সেবা দেওয়া হয়। সরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে রোগীর পাশাপাশি অভিভাবকদেরও বিশেষ কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা রয়েছে। কারণ এসব ক্ষেত্রে চিকিৎসার পাশাপাশি রোগী ও অভিভাবকদের সচেতনতা খুবই জরুরি। দেশের মাদকাসক্তের তুলনায় সরকারি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের শয্যা সংখ্যা অপ্রতুল। সরকার ইতিমধ্যে ৭ টি বিভাগীয় শহরে ২ শত শয্যার মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে।

সরকার ঘোষিত ভিশন-২০৪১ বাস্তবায়নে আমাদের যুব সমাজকে মাদকমুক্ত রাখার লক্ষ্যে ' শূন্য সহিষ্ণুতা ' নীতি অবলম্বন করা হয়েছে, যা কঠোরভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ গড়ে তোলা সম্ভব হবে।

#

পিআইডি ফিচার